International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 34-42
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.34-42

উনিশ শতকীয় সমাজে নিজ অবস্থান সম্পর্কে বঙ্গনারীর আত্মচেতনা: আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা

নীলাঞ্জনা পাত্র
এম.ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

19th century is considered a path breaking century from the perspective of women's history in India. By the introduction of education and various social reform programmes, the Indian social reformers tried to enlighten the women folk of Bengal as well as India. In this essay a special attention has been given to the statement of women about their own position in family and society. Though it is not an easy task to find out the voices of nineteenth century Bengali women as most of them were primarily zenana women who were uneducated and least conscious about their own position. But still there were some Bengali women who had their autobiographies or memoirs, which were published later or in the same century. Some traces of thoughts of some of them have been found in those autobiographies and memoirs. With the help of those writings, I have tried to show the reactions of Bengali women regarding the social evils of nineteenth century Bengal. Women who had written their autobiographies, were not always thought alike. By analysing the comparative differences between one writing with another, a special emphasis has been given on their different point of views regarding their own position.

Key Words: ***Bengali women, Autobiography, Nineteenth century, social evils, consciousness.***

বাংলা তথা ভারতবর্ষে উনবিংশ শতক নারী ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু এই শতকেই ভারতীয় জনজীবনের অর্ধাংশ অর্থাৎ ভারতীয় মহিলাসমাজকে সর্বপ্রথম শিক্ষা, বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও আইনী প্রয়াসের মাধ্যমে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তমসাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্ত করে এক আলোকিত তথা উন্নত জীবন দানের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছিল। যেসব মহৎ ব্যক্তিগণ বঙ্গ মহিলাদের মানোন্নয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের অবদান সম্পর্কে প্রায় সকলেই অবহিত। কিন্তু যাঁদের অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে এত উদ্যোগ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকগণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকগণও নিয়েছিলেন সেই নারীসমাজের নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে বক্তব্য কি ছিল তা নিঃসন্দেহে একটি আলোচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। যদিও উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে অনেক বঙ্গ নারীর নিজ বক্তব্য খুঁজে পাওয়া একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, কারণ সময়কালটা এমন যখন মেয়েদের

প্রধান পরিচয়ই ছিল অন্তঃপুরবাসিনী সেখানে সমকালীন সমাজ-সংস্কার-আইন সম্পর্কে তাঁদের মতামত উপস্থাপন করা বেশ কঠিন একটা বিষয়। কিন্তু তবু উনিশ শতকের বাংলায় কিছু মহিলা দ্বারা রচিত আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা যা উক্ত শতাব্দী অথবা পরবর্তী শতকে প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলির মাধ্যমে বঙ্গনারীদের একাংশের নিজস্ব স্বর, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীদের নিজস্ব ভাবনার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বিভিন্ন কুপ্রথা সম্পর্কে নারীদের মনোভাব কি ছিল তা তুলে ধরার সাথে সাথে, একজনের সাথে অন্য জনের রচনার তুলনামূলক পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী কীরূপ ছিল, পূর্বের দশকগুলি থেকে পরবর্তী দশকগুলিতে তাঁদের মানসিকতায় কোনরূপ পরিবর্তন এসেছিল কিনা তাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে আলোচ্য প্রবন্ধে ।

বাংলার প্রথম আত্মজীবনী রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবীর জন্ম উনিশ শতকের একেবারে প্রথম লগ্নে। তিনি যখন বারো বছর বয়সে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি- "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[১] শ্বশুরগৃহে যাওয়ার পর তিনি নিজেকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির সাথে তুলনা করে বলেছেন- "লোকে আমোদ করিয়া পাখি পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মত বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।"[২] অর্থাৎ নিজ অবস্থান সম্পর্কে একপ্রকার সচেতনতাবোধ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়, যা যথেষ্ট প্রশংসনীয় এবং ঐ সময়ের জমিদার পরিবারের গৃহবধূর নিকট আশা করা অনুচিত। কারণ তখন বঙ্গনারীর জীবনই ছিল অবরোধের ঘেরাটোপে আবৃত। নিজের বিবাহ সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি সুকৌশলে স্বামী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলেননি বা বলা ভাল এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র "লজ্জা"র আদর্শের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা অতিসরলীকরণ দোষের স্বীকার হবে। অন্ততঃ নিজেকে "বলীর পাঁঠা"র সাথে তুলনা করার মধ্যে দিয়ে আর যাই হোক 'লজ্জা'র যুক্তি ধোপে টেকেনা। ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবী তাঁর জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে যখন তাঁর স্মৃতিচারণা করেছিলেন সেখানে বিবাহ পরবর্তী বাসস্থান তথা শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কে একপ্রকার আশঙ্কার সুর ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে- "শ্বশুরবাড়ী আসিবার পূর্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া একমাস পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন। যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এসব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল; কেন না, তাহা হইলে এসব কষ্ট সহ্য করিতে হয়না।"[৩] এখানে হিন্দু নিয়মকানুনের অনুগতা সারদাসুন্দরীও কিন্তু বাল্য বিবাহকে যে মুক্ত মনে মেনে নিতে পারেননি সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয়না। আবার এই সারদাসুন্দরী দেবীই পুত্র কেশবচন্দ্রের বিবাহের পর তাঁর স্ত্রীকে প্রথম দেখার পর মন্তব্য করেছিলেন- "বৌ এত রোগা ও ছোট ছিলেন যে, কেশব যদি মন্দ ছেলে হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ হইয়া যাইত।"[৪] অর্থাৎ বৌ সুন্দরী না হওয়া তাঁর স্বামীর অন্য মহিলার নিকট গমনের কারণ হলে তা যে সমাজ, পরিবার এমনকী ছেলের মার কাছেও খুব স্বাভাবিক এক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হত এমনকী দুর্ভাগ্যের বিষয় নারী জাতির উন্নতির অন্যতম পথিকৃৎ কেশবচন্দ্র সেনের মাও যে স্বয়ং সেই ভাবনা থেকে মুক্ত ছিলেননা, তা নিঃসন্দেহে আক্ষেপের। তবে রাসসুন্দরী দেবীর মধ্যে এজাতীয় স্বভাবের বিশেষ বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ে না অন্ততঃ তাঁর আত্মজীবনী তো সেই কথাই বলে।

তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল যুগের চেয়ে অনেক এগিয়ে। সেজন্যই প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও পরিবারে পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের পার্থক্যের বিষয়েও সচেতন রাসসুন্দরী লিখেছিলেন- "আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল!...আমি যদি পুত্র সন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করি আমি পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গী।"[৫]

উনিশ শতকের বাঙালী মহিলাদের কেউ কেউ সেই শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মানোর ফলে এবং কেউ কেউ শতকের মধ্যভাগে জন্মানোয় বিশেষ কিছু সুযোগ পাননি বলে আক্ষেপ করেছেন, আবার কেউ কেউ সুযোগ পেয়েও তা সেই অর্থে কাজে লাগাতে সফল হননি। স্ত্রীশিক্ষা ছিল সেই বিশেষ সুযোগের মধ্যে অন্যতম। *আমার জীবন* প্রণেতা রাসসুন্দরী দেবী প্রায়শই লেখাপড়া শিখতে না পারার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এবং সেইসঙ্গে পরবর্তীকালের মেয়েরা সেই সুযোগ পাওয়ায় তাতে আনন্দ প্রকাশের সাথে নিজের কপালকেও দুষেছেন সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য- "এইটি ভারি আক্ষেপের বিষয় ছিল যে, মেয়েছেলে বলিয়া লিখিতে পড়িতে পাইতাম না। এখনকার মেয়েছেলেদিগের কি সুন্দর কপাল! এখন মেয়ে জন্মিলে অনেকেই বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, এ মত ভালই বলিতে হইবেক।"[৬] সারদাসুন্দরীও খেদ প্রকাশ করেছেন- "এখন যেমন মেয়েরা স্বছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে, এবং কত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিলনা....."[৭] তবে একইসাথে সারদাসুন্দরী ভাগ্যবান ছিলেন কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী। তাই দিনের বেলায় সকলের সামনে নিজ স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানো সেযুগে এক 'গর্হিত' ও 'নিন্দিত' কর্ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাঁর স্বামী তাঁকে রাত্রিবেলায় পড়াশোনা শেখাতেন। একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কৈলাসবাসিনী দেবীর। তিনি তো বাল্যকালে পিতৃগৃহে কোন শিক্ষালাভ করেননি এবং শিক্ষাগ্রহণে তিনি যে বিশেষ অভিলাষীও ছিলেননা বরং সেজাতীয় কোন আলোচনা তাঁর মনে বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতো তাও তিনি স্বয়ং স্বীকার করেছেন তাঁর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* নামক রচনায়- "অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম।"[৮] তবে তাঁর স্বামী প্রগতিশীলবাদী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্তই যে তাঁর বিদ্যাশিক্ষায় অনাগ্রহী মনোভাব সত্ত্বেও তাঁকে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন তাও জানিয়েছেন তিনি উক্ত গ্রন্থে। তবে তিনিও বিদ্যাকে 'দুষ্কর্ম' জ্ঞান করে এবং লোকনিন্দার ভয়ে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার কার্যক্রমকে গোপনে চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। অর্থাৎ কৈলাসবাসিনী কিন্তু যা বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা পুরোটাই তাঁর স্বামীর কৃতিত্বে। সূচনাপর্বে অন্ততঃ এব্যাপারে তাঁর যে কোন আগ্রহই ছিলনা তা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে রাসসুন্দরী ও সারদাসুন্দরীর সাথে তাঁর পার্থক্য বর্তমান। তাঁরা যেখানে শিক্ষালাভের সুযোগ না পাওয়ায় আক্ষেপ করেছিলেন অন্যদিকে কৈলাসবাসিনী হয়তো স্বামীর উদ্যোগ ও সাহায্য না পেলে কোনদিন লেখাপড়া শিখতেই পারতেন না কারণ রাসসুন্দরীর মত শিক্ষিত হওয়ার তাগিদ তিনি কোনদিনই অনুভব করেননি। তবে তুলনায় কিছুটা পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্মে ও ব্রাহ্ম পরিবেশ ও ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সুদক্ষিণা সেনও সেই অর্থে লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তাঁর স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীজীবী ও শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে যে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেননা তা সুদক্ষিণার লেখাতেই স্পষ্ট- "বিবাহের পর স্বামীকে পড়াইবার জন্য বিরক্ত করিতাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে পড়াইতে রাজী ছিলেননা"।[৯] কিন্তু তার জন্য তাঁর কণ্ঠে সেইরূপ প্রতিবাদী ধ্বনির সাক্ষ্য পাইনা যা আমরা রাসসুন্দরীর বক্তব্যে পাই। "তথাপিও স্কুল

ছাড়িয়া যাইতে হইবে, পড়াশুনা আমার ভাগ্যে নাই- তাই দুঃখ হইল। কিন্তু সকলের উপরে স্বামীর আদেশ....."[১০]- এই "স্বামীর আদেশে" বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন অসমাপ্ত রেখেই স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার বক্তব্যে সুদক্ষিণা দুঃখ পেলেও, সেই অর্থে স্বামীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা বিরক্তি কিন্তু কোথাও প্রকাশ করেননি। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁর স্মৃতিকথা *পুরাতনীতে* নিজ শৈশবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে জানিয়েছেন সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়া নিন্দিত ছিল। তাঁর মা যদিও তা উপেক্ষা করেই গোপনে রাত জেগে পড়াশুনা করতেন এবং একদিন বালিকা জ্ঞানদানন্দিনী তা হঠাৎ দেখে ফেলায় "তিনি তাড়াতাড়ি সেগুলো সব ঢেকে ফেললেন, পাছে আমি ছেলেমানুষ কাউকে বলে ফেলি।" যদিও জ্ঞানদানন্দিনী স্বয়ং পিতৃ উদ্যোগে পাঠশালায় ভর্তি হন এবং সমস্ত পুরুষ বা ছাত্রদের সাথেই তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা হয়েছিল।[১১] ১৮৫৭ সালে অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম। সমসাময়িক বঙ্গ সমাজে স্ত্রী শিক্ষার যে চিত্র অন্যান্য মহিলা আত্মজীবনীকার দের রচনাই পাওয়া যায় তা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়না, উনিশ শতকের মধ্যভাগেও স্ত্রীশিক্ষা সমাজে সেই অর্থে মান্যতা পায়নি, গোপনে মহিলাদের পড়াশোনা শেখার প্রবণতাই তার প্রমাণ। তবে প্রসন্নময়ী তার গ্রামে নারীশিক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন তা সে যুগের প্রেক্ষিতে রীতিমতো চমকপ্রদ। তাঁর মতে, সে সময় তাঁর গ্রামের প্রায় সমস্ত মহিলা কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ পাঠ করতে পারতেন তাই নয় তাঁরা নিজেদের নামও স্বাক্ষর করতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষিতা ছিলেন কাশীশ্বরী নামক এক বিধবা। তাঁর গৃহে তিনি একটি পাঠশালাও খুলেছিলেন যেখানে তিনি গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের সাথে গ্রামের বয়স্কা মহিলাদের জন্যও পৃথক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[১২]

তৎকালীন সমাজের দেশাচারের নামে বিভিন্ন কুপ্রথা সম্পর্কিত সচেতনতাও প্রকাশ পেয়েছিল নারী দ্বারা রচিত আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথায়। নিস্তারিণী দেবী তাঁর *সেকেলে কথা*-য় কুলীন প্রথার ভয়াবহতা প্রকাশ করেছেন খুব সাবলীল ভঙ্গিতে। যেখানে হরিচরণ এক বিয়ে করে বিশেষ কিছু অর্থ না পাওয়ায় যখন তাঁর পিতার মনের অবস্থা বুঝতে পারে তখন বাবাকে সান্ত্বনা দিতে সে বলাছিল- "এতে হ'ল না বাবা! মনে তুমি কিছু করনা! মাকে কিছু ব'ল না; চল আমি আর একটা বিয়ে করে তোমাকে কিছু এনে দিই।"[১৩] নিজে কুলীন পরিবারের কন্যা হওয়ায় এমন পাত্রের সাথে তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল যে নিজে মাত্র ২৫ বছর বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ৩০/৪০ টি বিবাহের খবর নিস্তারিণীর পরিবারের লোকেরা আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু "জাত রাখা মান রাখা"র তাগিদ সেসময় অধিক প্রাধান্য পাওয়ায় বাকী কুলীন কন্যাদের মতো নিস্তারিণীরও বিবাহের পর পিতার গৃহই তাঁর ঠিকানা হিসেবে থেকে গিয়েছিল। সমসাময়িক হিন্দু সমাজ মেয়েদের যে কেবলমাত্র একটি বোঝার অধিক কিছু মনে করত না সে সম্পর্কেও সচেতন নিস্তারিণী দেবী লিখেছিলেন- "মেয়ের খাতির সত্যি সত্যি যে জাত করে, সে জাতের মেয়ের ঘরে বিয়ে কর্ত্তে বর আসে। যাদের গির্জ্জায় বিয়ে হয় তারা মেয়ে ছেলে সমান দেখে। আমাদের নৌকাতেই মেয়ে নিয়ে মেয়ের বাপ মা চল্লো।"[১৪] আবার এই নিস্তারিণীরই যখন স্বামী মারা যায় তখন সে নিজেকে "ভাগ্যবতী" মনে করেছিল স্বামীর মৃত্যুর খবর যথা সময়ে পাওয়ার জন্য। তাঁর বাকী সতীনদের মধ্যে অনেকেই সেই খবর দেরীতে পাওয়ায় তাঁরা মাছ-ভাত খেয়ে মহাপাপ করেছিলেন বলে তিনি মনে করেছিলেন যা তাঁর স্মৃতিকথায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমেই স্পষ্ট।[১৫] তবে যেই কুলীন বিবাহের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র কিছু তির্যক মন্তব্যেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন নিস্তারিণী দেবী, সেই কুলীন প্রথার ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে ও নিজ কন্যাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতেই কিন্তু সুদক্ষিণা সেনের মা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণেও

পিছপা হননি। সমসাময়িক হিন্দু সমাজকে 'কারাগারে'র উপমায় উপমিত করে সেই কারাগার থেকে মুক্তির উপায় সুদক্ষিণা ও তাঁর মা উভয়েই খুঁজেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের মধ্যে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজে আসা তাই সুদক্ষিণার কাছে "অন্ধকার কারাগার হইতে মুক্ত বাতাসে আসা"র সমান।[১৬] কৌলীন্য প্রথার মতো কুপ্রথার বিরোধিতা করতে কৈলাসবাসিনী দেবীকেও সরব হতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* নামক গ্রন্থে তিনি হিন্দু সমাজের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরূদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বলে- "এই দেশাচারের বশীভূত হইয়া আমাদিগের হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহোদয়গণ কি অপ্রিয় কার্য্যই না করিতেছেন। তাঁহারা বিষম কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষার্থে স্ব স্ব দুহিতাগণকে অতি শৈশবকালেই অযোগ্য পাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কতই শ্লাঘা প্রকাশ করেন।"[১৭] কুলীন ব্যক্তিবর্গের জন্য ব্যভিচার প্রবণতা যে বাংলায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল সে কথাও অত্যন্ত ক্ষোভ ও ঘৃণার সাথে তিনি বর্ণনা করেছেন। কুলীন ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র অর্থ ব্যতীত যে কিছুই বুঝতেন না তার উদাহরণ হিসেবে তিনি কৃষ্ণনগরের এক ঘটনার স্মৃতিচারণা করেছেন। যেখানে কোন কুলীন গৃহস্থের জামাতা গৃহে এলে তাঁর স্ত্রীর নিকট সে জানতে চায়- "কেমন আমার জন্য কিছু কিছু রাখিতে পারিয়াছ কি না?" একথা শুনে স্ত্রীর জবাব ছিল, "আমি মেয়েমানুষ কোথায় কি পাইব যে তোমার জন্য রাখিব, স্বামিগণই স্ত্রী দিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন ও অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান করেন, তুমি আমার জন্য কি আনিয়াছ বল" এজাতীয় অধিকারবোধ সম্পন্ন স্ত্রীর যুক্তিসম্মত কথা শোনামাত্রই সেই স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করেছিলেন।[১৮] এজাতীয় ঘটনা ছিল বাংলার ঘরে ঘরে। তবে এখানে কৈলাসবাসিনী দেবীর কুলীন প্রথার তীব্র বিরোধিতার পাশাপাশি ঘটনায় উল্লিখিত যে মহিলার কথা আমরা জানতে পারি তিনি যেভাবে স্বামীর অসম্মানজনক প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্বামীর তাঁর স্ত্রীর প্রতি কি কর্তব্য থাকা উচিৎ তা তাঁর স্বামীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাতে সমাজের সকল মহিলাই যে কেবল সমান ছিলেননা, 'আদর্শ স্ত্রী'র তথাকথিত ধারণাকে নস্যাৎ করে যে কেউ কেউ নিজ অধিকার লাভের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্ন করার সাহসও রাখত তার প্রমাণ মেলে। নিজ স্বামীকে কাছে পাওয়ার বাসনা দমন করতে না পেরে অর্থলোলুপ স্বামীর অর্থকামনা পূরণের উদ্দেশ্যে সেই নারী নিজ পরিবারের সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে কলকাতায় এসে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন অর্থ উপার্জনের আশায়। যেই অর্থের বিনিময়ে তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সহবাসে রাজি হবে।[১৯] কেন সেসময় অধিকাংশ কুলীন কন্যারা ব্যভিচারের পথ বেছে নিত তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা কৈলাসবাসিনীর রচনায় পাওয়া যায়। প্রসন্নময়ীর বাবা স্বনামধন্য সিভিল সার্ভিস অফিসার হয়েও কেবলমাত্র কুলীন পরিবারের কৌলীন্য রক্ষা করতে মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন মানসিক ভারসাম্যবিহীন এক পুরুষের সাথে। রাসসুন্দরী নিস্তারিণীর মতো কৈলাসবাসিনীও সমাজের নারী পুরুষের মধ্যেকার বৈষম্য নিয়ে যে কেবলমাত্র সচেতনই ছিলেননা, কন্যা সন্তান জন্মালে কীভাবে বাংলায় বিভিন্ন পরিবারে 'শোকে'র ছায়া নেমে আসে তারও করুণ বর্ণনা রয়েছে তাঁর রচনায়- " কিন্তু যদি অদৃষ্টক্রমে কন্যা ভূমিষ্ঠা হয়, তবে সেই কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মাতা যে কতই দুঃখিতা হয়েন তাহা বলিবার নহে। অধিক কি কহিব সকল বিষাদের চিহ্ন যে রোদন কেহ কেহ তাহাও করিয়া থাকেন এবং আর আর সুহৃদগণও অতিশয় মনস্তাপ করেন। পুত্র জন্মাইলে যেরূপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্র ভোজন, স্বস্ত্যয়ন এবং পুত্রের আয়ুবৃদ্ধি কারণ বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী দান, ও দেশ বিদেশস্থ আত্মীয় কুটুম্বগণকে জ্ঞাপানার্থে নাপিত প্রেরণাদি যে সকল মঙ্গলাচরণ হইয়া থাকে, কন্যা জন্মাইলে তাহার কিছুই হয়না, বরং তদ্বিপরীত কার্য্যই হইয়া থাকে।"[২০]

এই যুগের অপর একটি কুপ্রথা ছিল বিধবার বিবাহ না হওয়া এবং সেই সম্পর্কে কিছু বক্তব্যও প্রতিফলিত হয়েছে উনিশ শতকীয় মহিলা দ্বারা রচনায়। সুদক্ষিনা সেন তাঁর *জীবন স্মৃতি* তে বলেছেন- "পুরুষগণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর এমনকি বর্তমানে, যাহা খুশি তাই করিতে পারিবে। কিন্তু হতভাগিনী বিধবা শুষ্ককণ্ঠেজল পাওয়া দূরের কথা, চিতাভস্ম ধুইলেও ধর্ম নষ্ট হবে।"[২১] হিন্দুসমাজে বিবিধ চাপে পিষ্ট এক 'পার্বতী মাসি'র কথাও সুদক্ষিণার রচনায় পাওয়া যায়, যে কিনা মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই বিধবা হয়েছিল। কিন্তু ওরকম অর্থহীন বিবাহের ও বৈধব্য সত্ত্বেও পার্বতী মাসি পুনরায় বিবাহের কথা ভাবতেও পারেনি কারণ বিধবার পুনর্বিবাহের কথা চিন্তা করাও ছিল 'পাপ', যদিও ততদিনে বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত রূপ পেয়ে গিয়েছিল। তবে ব্যতিক্রমও যে ছিল তারও উল্লেখ মেলে সুদক্ষিণার আত্মজীবনীতে।[২২] বিধবাদের নির্জলা একাদশী পালনের কঠোরতা সুদক্ষিণার দাদামশাইয়ের একেবারে অপছন্দ থাকায় তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়ায় গ্রামে নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে বিধবারা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করবে না। তাঁরা দুধ, কলা, মিষ্টি ইত্যাদী খেতে পারবেন বলে তিনি বিধান দিয়েছিলেন কারণ নিরম্বু উপবাস করে শরীরকে কষ্ট দেওয়া তাঁর নিকট পাপাচারের সমান হিসেবে গণ্য হয়েছিল। উপরন্তু সুদক্ষিণার মা বিধবা হওয়ার পর তাঁর সেই দাদামশাই তাঁর ঠাকুমাকে বলে এসেছিলেন- "আমার কন্যাকে একাদশীর দিন উপবাস করাইবেন না।" তবে যথেষ্ট বিস্ময় উদ্রেককারী ঘটনা হল তাঁর ঠাকুমা কিন্তু সেই অনুরোধ অমান্য করেননি, সে তাঁর পুত্রবধূকে ঐ দিন দুধ পান করাতেন।[২৩] দুজন প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির বিধবাদের প্রতি এরূপ ঔদার্যপূর্ণ আচরণের প্রশংসা না করে পারা যায়না। নিস্তারিণী দেবীও বৈধব্য প্রাপ্তির পর লিখেছিলেন- "আমি বিধবা হলুম, আমার দুঃখের আরম্ভ হল।"[২৪] কুলীন কন্যা নিস্তারিণী দেবী বাকি কুলীন কন্যাদের ন্যায় যে বিবাহের পরেও পিতৃগৃহেই ছিলেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধবা হওয়ার পর তাঁর নতুন করে দুঃখের জীবনের কী আরম্ভ হল, স্বামী থাকাকালীনও সে কি স্বামীহীন অবস্থায় এক বিধবার ন্যায়ই জীবনযাপন করতেন না? হ্যাঁ, হয়তো বৈধব্য জীবনের কঠোর নিয়ম কানুন তাঁকে সেই সময় মেনে চলতে হয়নি, কিন্তু পিতৃগৃহে সর্বদা ভাই ও ভাইপোদের দাক্ষিন্যে অপমানিত, লাঞ্ছিত যে তাঁকে বহুবার হতে হয়েছিল তাও তাঁর রচনায় স্পষ্ট। তার পরেও স্বামীর মৃত্যুর পর সধবাদের প্রতীকী চিহ্নগুলি খুলে ফেলার পরই তাঁর মনে হয়েছিল এবারই তাঁর 'প্রকৃত দুঃখে'র জীবন শুরু। "বিধবার ব্যারাম আবার কি?" আপন পরিবারের কাছের মানুষও যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে বৈধব্য জীবনের দুঃসহতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করত তা নিস্তারিণীর দাদার এই অমানবিক উক্তি থেকেই স্পষ্ট।[২৫] বিধবা বিবাহ আইন ও তার বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল কৈলাসবাসিনী দেবী এই বলে খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন - "এই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রমত ও যুক্তিসিদ্ধ এবং এই বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত লোকে কতই কষ্ট সহ্য করিতেছে, তথাপি সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য যে এই বিধবা বিবাহ ইহাতে সহসা প্রবৃত্ত হইতে পরাঙমুখ হইতেছে।"[২৬] প্রসন্নময়ী স্বয়ং কুলীন পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাঁর মত তাঁর পিসিদেরও অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের বৈধব্য প্রাপ্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বর্ণগত শুদ্ধতা রক্ষার কারণে আজীবন তাঁরা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে গেছেন।[২৭] সারদাসুন্দরীর আত্মকথাতেও তাঁর বৈধব্য জীবনের যন্ত্রণাময় চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে-

> "স্বামীর মৃত্যুর দিন পনের পরেই আমার সেজ দেবর প্রথম আমার ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তেতালার ঘরে যে বড় খাটে আমার স্বামী শুইতেন, ঘরের কপাট ভাঙিয়া সে খাটখানি আমার সেজ দেবর লইয়া গেলেন, আমি কাঁদিলাম।.....আমার শাশুড়ী মাথা খুড়িতে লাগিলেন তাহাতে আমার বড় ভয় ও দুঃখ হইল। .....আমি সবসময় আমার ছেলে

> মেয়েদের লইয়া এক ঘরে দরজা দিয়া পড়িয়া থাকিতাম। ভয়ে ভয়ে ভাবিতাম যদি ইঁহারা আমাকে ছেলে মেয়ে শুদ্ধ তাড়াইয়া দেন, তবে আমি কোথায় যাইব? এইরূপে আমার দিন যাইতে লাগিল।"[২৮]

সদ্য স্বামীহারা পুত্রবধূর ওপর অন্য ছেলে কর্তৃক এহেন মানসিক অত্যাচার দেখার পরেও সারদাসুন্দরীর শাশুড়ী কেবলমাত্র শোকে "মাথা খোড়া" ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। তিনি নিজে একজন বিধবা হওয়ায় তাঁকেও ছেলেদের দাক্ষিন্যেই বেঁচে থাকতে হয়েছিল তাই বয়স ও সাম্মানিক দিক দিয়ে তিনি পরিবার প্রধান হলেও বাস্তবে যে তাঁর মতামত বা চাওয়া পাওয়ার কোন মূল্য ছিলনা তা তাঁর কার্যাবলী দ্বারাই প্রমাণিত। অন্যদিকে নিজ সন্তানদের তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার আছে একথা জেনেও সারদাসুন্দরীর সন্তানসহ বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হতে পারার আশঙ্কা প্রাচীন হিন্দু আইনের স্বচ্ছতা ও বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে একটা প্রশ্নচিহ্ন তুলে দেয়। বাস্তবেও যে তাঁর ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের পিতৃব্যদের চাতুরতায় পৈত্রিক সম্পত্তির সিংগভাগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তারও উল্লেখ মেলে তাঁর আত্মকথায়।

রাসসুন্দরী, সারদাসুন্দরী, নিস্তারিণী, কৈলাসবাসিনী, সুদক্ষিণা এঁরা সকলেই ছিলেন উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজের সম্ভ্রান্ত্র গৃহের কন্যা-বধূ। এঁনারা নিজ আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথায় নিজ জীবন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীশিক্ষা, কৌলীন্য প্রথা বা বিধবাদের দুরবস্থার ন্যায় সমসাময়িক সমাজের সামাজিক সমস্যাগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনা করেছেন বা সেগুলি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এঁনারা যা কিছু সমালোচনা বা প্রতিবাদ তা করেছেন সবটাই নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে, অত্যন্ত সংযত ভাষায়। কোথাও কোথাও হয়তো জীবনের ঘটনাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে অ-সচেতন ভাবেও উপরিউক্ত সামাজিক সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। সবক্ষেত্রেই যে প্রতিবাদী চেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েই তাঁরা সেসব লিখেছিলেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু ভদ্র পরিবারের মহিলা হয়েও সকলেই যে সমাজের নিয়ম মেনে গৃহের চারদেওয়ালের গণ্ডীবদ্ধ জীবনকে বরণ করে আজীবন কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে কোন কোন মহিলা উচ্চ বংশজাত কুলের মুখে কালিমা লেপন করে সমাজের তোয়াক্কা না করেই পতিতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন আবার কেউ উচ্চকুলজাত না হয়েও নিজ গুণে সমাজে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করেও নিজেকে বেশ্যা হিসেবেই পরিচয় দিয়েছিলেন সে দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়। এঁদের মধ্যেও কেউ কেউ জীবন সায়াহ্নে এসে আত্মজীবনী বা আত্মকথা লিখেছিলেন যেখানে তাঁরা সমাজের বিরোধিতা পূর্বোক্ত মহিলাদের ন্যায় সংযমের পরোয়া না করে খোলা মনেই করেছিলেন। উনিশ শতকীয় কলকাতার থিয়েটারের 'সম্রাজ্ঞী' বিনোদিনী দাসী থিয়েটারে অভিনয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তির 'রক্ষিতা' হিসেবে জীবন অতিবাহিত করলেও শিক্ষিতা ও শিল্পরুচিগুণসম্পন্না একদা বিখ্যাত বিনোদিনীও কেবলমাত্র তাঁর সামাজিক অবস্থানের কারণে খুব শীঘ্রই সমাজ ও সাধারণ মানুষের স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর পেশাদারী জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এমন এক সময় যখন তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি মধ্যগগণে। কিন্তু কেন তিনি এরূপ এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার স্পষ্ট কারণ তাঁর *আমার কথা*-য় না থাকলেও নাট্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের থেকে প্রাপ্ত প্রতারণা তাঁর জীবনে যে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার উল্লেখ মেলে তাঁর আত্মজীবনীতে। যেই থিয়েটার তৈরীর অর্থের জন্য সে নিজেকে অন্যের 'রক্ষিতা' বানাতেও দ্বিধাগ্রস্ত করেননি, সেই থিয়েটার তৈরীর পর দেখা গেল সকলে তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নব প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের নাম বি থিয়েটারের

বদলে স্টার থিয়েটার রেখেছেন।[২৯] তিনি নিজেকে "বারাঙ্গনা" হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই হয়তো যেই শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী পুরুষ সমাজ বিনোদিনীর থিয়েটারের এবং খোদ বিনোদিনীরও অন্ধ ভক্ত ছিলেন, সেই সমাজই তাঁর সাহিত্যগুনে সমৃদ্ধ *আমার কথা*-কে 'ভদ্রলোকের সাহিত্য' থেকে বর্জন করেছিলেন।[৩০]

তবে এই সকল মহিলা আত্মজীবনী রচয়িতাদের অনেকেই সামাজিক সমস্যার কথা তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিলেও তাঁদের সময়কালে যে নানাবিধ নারীর অবস্থান উন্নয়নার্থে আইন প্রণীত হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে প্রায় সকলেই নীরব। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ বা কুলীন প্রথা, বিধবা সমস্যা বিষয়ক নানা কথা তাঁদের লেখায় স্থান পেলেও সেই সময়েই যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়েছিল, বহুবিবাহ রোধ করার জন্যও আইন প্রণয়নে বাংলায় বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল, সহবাস সম্মতি বিল ও আইন নিয়ে এত শোরগোলের যে সাক্ষী বাংলা হয়েছিল এগুলির প্রায় কোন উল্লেখই কিন্তু একটি আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথাতেও নেই যা যথেষ্ট কৌতুহল উদ্রেককারী। তবে এর যথার্থ কারণ উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বাইরের পৃথিবী, আইন কানুন ইত্যাদীতে সে সময় মহিলারা যে সহজে বিচরণ করতে পারতেননা তা একটি সঙ্গত কারণ অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো একজন শিক্ষিতা মহিলা যিনি কিনা সন্তানসহ একা সেই সময়েও সুদূর ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁর ক্ষেত্রে অন্তত বাইরের পৃথিবীর দ্বার অবরুদ্ধ ছিল একথা বলা যায়না। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নারী দ্বারা রচিত এই আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথার মাধ্যমে অন্ততঃ এটা জানা সম্ভব যে উনিশ শতকের সেই গণ্ডীবদ্ধ জীবনের মধ্যেও কিছু মহিলা নিজেদের জীবন অভিজ্ঞতা লিখে বা জানিয়ে যাওয়ার মত সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। নির্ভয়ে কেউ কেউ জানাতে পেরেছিলেন সামাজিক কুসংস্কারের বিরূদ্ধে নিজস্ব মতামত, যা তাঁদের নিজ অবস্থান সম্পর্কে নিজ সচেতনতারই এক বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যসূচি:

১। রাসসুন্দরী, শ্রীমতি, *আমার জীবন* ; ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, পৃ.২০।

২। ঐ, পৃ.২২।

৩। সারদাসুন্দরী, দেবী, *আত্মকথা;* ভারত মহিলা প্রেস, ঢাকা, পৃ.২।

৪। ঐ, পৃ.৪৩।

৫। প্রাগুক্ত নং ১, পৃ.৩৮।

৬। ঐ, পৃ.৩৩।

৭। প্রাগুক্ত নং ৩, পৃ.৩-৪।

৮। কৈলাসবাসিনী, শ্রীমতি (১৭৮৫ শক), *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা;* গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা, পৃ. গ্রন্থ রচয়িত্রীর নিবেদন।

৯। সেন, সুদক্ষিণা (২০০২), *জীবনস্মৃতি* ; দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.৭৯।

১০। ঐ, পৃ.৯৫।

১১। দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী (১৯৫৬), *পুরাতনী* ; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.৬।

১২। Ghosh, Srabashi (25th Oct. 1986), "Birds in a Cage: Changes in Bengali Social Life as Recorded in Autobiographies by Women", *Economic and Political Weekly*, vol.xxi, No.43, , p.91.
১৩। দেবী, নিস্তারিণী (১৯৮২), সেকেলে কথা; জানা, এন.সি. (সম্পা.), আত্মকথা (দ্বিতীয় খণ্ড); অনন্যা পাবলিকেশন, ক্যালকাটা, পৃ.১১।
১৪। ঐ, পৃ.২০।
১৫। ঐ, পৃ.২৯।
১৬। প্রাগুক্ত নং ৯, পৃ.৭।
১৭। প্রাগুক্ত নং ৮, পৃ.১।
১৮। ঐ, পৃ.২২।
১৯। ঐ।
২০। ঐ, পৃ.৩২।
২১। প্রাগুক্ত নং ৯, পৃ.৮।
২২। ঐ।
২৩। ঐ, পৃ.৪০।
২৪। প্রাগুক্ত নং ১৩, পৃ.৩১।
২৫। ঐ, পৃ.৩২।
২৬। প্রাগুক্ত নং ৮, পৃ.৩৫।
২৭। প্রাগুক্ত নং ১২, পৃ.৮৯।
২৮। প্রাগুক্ত নং ৩, পৃ.২২-২৩।
২৯। দাসী, বিনোদিনী (১৩৭৬ ব:), *আমার কথা ও অন্যান্য রচনা;* সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, পৃ.৪১।
৩০। ঐ, পৃ.১০।